মোদীর আবেদনে সাড়া দিচ্ছেন কোটি কোটি দেশবাসী, এটা শুভ ইঙ্গিত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি দাবি করেছেন যে, গত নয় মাসে সারা দেশে পরিসংখ্যান অনুযায়ী রেল টিকিটের ভর্তুকি ছেড়েছেন প্রায় ৪২ লক্ষ সিনিয়র সিটিজেন যাত্রী। এই সময়ের মধ্যে রান্নার গ্যাসের উপর ভর্তুকি ছেড়েছেন প্রায় সওয়া এক কোটি পরিবার। এই পরিসংখ্যানের সত্যতাকে মাথায় রেখে বলা যেতেই পারে যে, আমাদের দেশের নাগরিকরা অনেকটাই সচেতন হচ্ছেন এবং উদারতা দেখাচ্ছেন। এরফলে দেশের অর্থনীতির অভিমুখ উন্নততর গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই যে দেশের নাগরিকদের প্রতি নাগরিকদের সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদান, এই ঘটনাকে যুগান্তকারী বললেও কম বলা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরণের সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা যে শতাংশের হিসাবে সামান্য হলেও ফলপ্রসূ হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তা দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। এমনকি তিনি এও জানিয়েছেন যে, তাঁর চিকিৎসকদের প্রতি যে অনুরোধ ছিল, মাসে অন্তত একবার বিনামূল্যে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের চিকিৎসা করুন, সেই অনুরোধেও সাড়া মিলেছে। প্রধানমন্ত্রীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় সওয়া এক কোটি অন্তঃসত্ত্বার বিনামূল্যে চিকিৎসা করেছেন চিকিৎসকরা। এটাও একটি পজিটিভ মুভমেন্ট বলে ধরা যেতেই পারে। প্রধানমন্ত্রীর জনসাধারণের প্রতি বিভিন্ন আবেদন, অর্থাৎ যেগুলি জনসেবামূলক আবেদন, সেগুলির সদর্থক অগ্রগতি ভারতের সমগ্র মানসিকতার স্ফুরণ ঘটাচ্ছে। ভারতীয়দের সর্বকালীন উদার মানবিকতার যে বিচ্ছুরণ স্বামী বিবেকানন্দ এক সময় শিকাগোয় দেখিয়েছিলেন, তারই প্রতিফলন ঘটছে ভারতীয়দের চিন্তায়, মননে ও ব্যবহারে। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর এই ছোটো ছোটো অথচ মানবিক আবেদনগুলি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (সুরেন্দ্রের প্রতি)—মাঝে মাঝে এসো। ন্যাংটা বলতো, ঘটি রোজ মাজতে হয়; তা না হলে কলঙ্ক বড়বে। সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার।

"সন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ; তোমাদের পক্ষে তা নয়। তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে।"

"বীর ভক্ত না হলে দু দিক রাখতে পারে না; জনক রাজা সাধন ভজনের পর সিদ্ধ হয়ে সংসারে ছিল। সে দুখানা তলোয়ার ঘুরাতো; জ্ঞান আর কর্ম।"

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

এই সংসার মজার কুটি।

আমি খাই দই আর মজা লুটি।।

জনক রাজা মহাতেজা তার বা কিসে ছিল ত্রুটি।

সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।।

"তোমাদের পক্ষে চৈতন্যদেব যা বলেছিলেন, জীবে দয়া, ভক্তসেবা আর নাম সংকীর্তন।"

"তোমায় বলছি কেন? তোমার হৌস-এর (House, সদাগরের বাড়ির) কাজ; আর অনেক কাজ করতে হয়। তাই বলছি।"

"তুমি অফিসে মিথ্যা কথা কও তবে তোমার জিনিষ খাই কেন? তোমার যে দান ধ্যান আছে; তোমার যে আয় তার চেয়ে বেশি দান কর; বারো হাত কাঁকুরের তের হাত বিচি।"

"কৃপণের জিনিষ খাই না। তাদের ধন এই রয় রকমে উরে যায়। ১ম ঃ- মামলায় মোকদ্দমায়; ২য় ঃ- চোর ডাকাতে; ৩য় ঃ- ডাক্তার খরচে;৪র্থ ঃ- আবার বদ ছেলেরা সেই সব টাকা উড়িয়ে দেয়; এই সব।"

"তুমি যে দান ধ্যান কর, কর খুব ভালো। যাদের টাকা আছে তাদের দান কার উচিত। কৃপণের মন উড়ে যায়। কৃপণের ধন উরে যায়, দাতার ধন রক্ষা করা হয়, সৎকাজে যায়। ও-দেশে চাষারা খানা কেটে ক্ষেতে জল আনে। কখনও কখনও জলের এতো তোড় হয় যে খেতের আল ভেঙ্গে যায়, আর জল বেড়িয়ে যায় ও নষ্ট হয়। তাই চাষারা আলের মাঝে মাঝে ছেঁদা করে রাখে, তাকে ঘোগ বলে। জল ঘোগ দিয়ে একটু একটু বেড়িয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল ভাঙ্গে না।

দিনপঞ্জিকা

১৬ আষাঢ়, ভাং ১০ আষাঢ়, **১ জুলাই**, ১৬ আহার, সংবৎ ৩ আষাঢ় বদি, ১৬ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৯, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৪। **রবিবার**, তৃতীয়া দিবা ঘ ৩।২১ মিঃ। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৫৫ মিঃ। বিষ্কুম্ভযোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৫ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৩।২১ গতে ববকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।১৫ গতে বালবকরণ। **জন্মে**— মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ঘ ৭।৫৫ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ। **যোগিনী**—অগ্নিকোণে, দিবা ঘ ৩।২১ গতে নৈর্ঋতে। **বারবেলাদি** ঘ ১০।১ গতে ১।২২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১।১ গতে ২।২০ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই, দিবা ঘ ২।৯ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈষাণে নিষেধ, দিবা ঘ ৩।২১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**-- নাই। **বিবিধ**— তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট। **নবদ্বীপ নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল (গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়ের তিরোভাব তিথি। ভারত রত্ন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আবির্ভাব (১৮৮২ খ্রীঃ) ও তিরোভাব (১৯৬২ খ্রীঃ) দিবস** এবং **চিকিৎসক দিবস** (১লা জুলাই)। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।৪৮ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৮ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৫৪ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ আষাঢ়, ভাং ১০ আষাঢ়, **১ জুলাই**, ১৬ শওয়াল, ১৬ আহার, উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।২২, রবিবার, তৃতীয়া দি ঘ ২/২০, সেহরী শেষ ৩/২২, ইফতার ৬/৩০।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ভ্রমণ সাহিত্যে বিহার

অধ্যাপক পিরুপদ মালিক
চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

পর্ব ১

"এক বিভূতি চলে গেছে,
দাগা দিয়ে আমার প্রাণে।
আর বিভূতি তুমি আছ,
চেয়ে আছি তোমার পানে।"

—কালিদাস রায়ের কবিতার এই দু'লাইন-ই বুঝিয়ে দেয় বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেলেও মুখোপাধ্যায় আছেন। যিনি বাংলার সাহিত্যে আকাশ উজ্জ্বল করে রাখবেন।

বিহারবাসী বাঙালির গর্বের, আনন্দের এবং সাহিত্যরসের অন্যতম স্রোত-উৎস বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭)। ইংরেজি সাহিত্যে চার্লস ডিকেন্সের জনপ্রিয়তা সর্বজন বিদিত। অথচ ডিকেন্সের আমলেই আর এক দিক্‌পাল থ্যাকারে—তাঁর নাম পর্যন্ত জানেন না এমন অনেকেই আছেন। কারণ থ্যাকারে মন্দ চরিত্রই বেশি দেখেছেন, আর ডিকেন্স মন্দ চরিত্রকেও ভালো চোখে দোষে-গুণে বিচার করেছেন। আমাদের বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঘৃণ্য চরিত্রের মধ্যেও একটু মার্জনার স্থান দেখেছিলেন। মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম শর্ত। যদিও ডিকেন্সের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি, তবুও অনুভবষন্ধ পাঠককে ছুঁয়ে যায় তাঁর রচনা। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে বিহারবাসী বাঙালি সাহিত্যিকদের দান কোনক্রমেই অবহেলার নয়। শরৎচন্দ্র, বনফুলের রচনায় বিহার- মধ্যভাদেশের অরণ্যভূমি, আর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় মিথিলার মাটি ও মানুষ। যে মিথিলার সঙ্গে বাংলার সাহিত্য সেতু বন্ধনের আদিস্রষ্টপতি বিদ্যাপতি।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তা আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় সন্ধান করেছে সৃষ্টির বিচিত্র পথ—গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের নানা আঙ্গিক প্রকরণ। কিন্তু শিল্পস্রষ্টাকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানার উপায় হল তাঁর ভ্রমণসাহিত্যগুলি। হয়ত তাঁর বিপুলায়তন ছোটগল্পের কাছে হারিয়ে যায় কতকগুলি ভ্রমণসাহিত্য মূলক রচনা। তিনি চারটি ভ্রমণসাহিত্য—'দৃয়ার হতে অদূরে' (১৩৫৯), 'কুশী-প্রাঙ্গনের চিঠি' (১৩৬০), 'যাত্রায় জয়যাত্রা' (১৩৬৮) এবং 'একই পথের দুই প্রান্তে' (১৩৭৬) লিখেছেন। আমার আন্তর্জাতিক

আলোচনা চক্রের বিষয়ের কথা মাথায় রেখে 'কুশী-প্রাঙ্গনের চিঠি' (১৩৬০) এবং 'অযাত্রার জয়যাত্রা' (১৩৬৮)কে বেছে নিয়েছি। এই দুটিরই প্রেক্ষাপট বিহার। প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে মনোভাবের বিচার এবং সেই মনোভাব তাঁর লেখক জীবনকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করেছে তা আলোচনার নিরিখেই বোঝা যাবে।

আত্মনিষ্ঠ ভাব ও ভাবনাকে ইচ্ছামতো রূপ দেবার আধার হল ভ্রমণসাহিত্য। আত্মনিষ্ঠ মনকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মুক্তি দিয়েছেন নানাভাবে। কারণ ভ্রমণসাহিত্যে লেখক যতটা সহজ ও অন্তরঙ্গ হতে পারেন— এমন বোধ হয় আর কোথাও হতে পারেন না। যখন মনে হয়েছে বেরিয়ে পড়েছেন নিঃসঙ্গভাবে, পথের মাঝে যাকে পেয়েছেন জুড়িয়ে নিয়েছেন। সবসময় যে মানুষকেই কাছে পেয়েছেন তা নয়—প্রকৃতিকেও খুব অন্তরঙ্গভাবে কাছে পেয়েছেন। যেখানেই প্রকৃতি তাকে মুগ্ধ করেছে সেখানেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, জগৎ ও জীবনের পটভূমিতে নিজে মুখোমুখি বসে পড়েছেন। বিহারের মাটি ও মানুষকে নিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনী 'কুশী-প্রাঙ্গনের চিঠি'। এই ভ্রমণ কাহিনী লেখার আগে কুশী প্রাঙ্গনে ঘুরেছিলেন। ইতস্তত ভ্রমণকালে মিথিলার সৌরাঠ মেলা যেটা বিখ্যাত বরমেলা নামে পরিচিত সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে পাগড়ি মাথায় বিভূতিভূষণকে ঘুরতে দেখে মৈথিলী বর ভেবে লোকে ভুলও করেছিলেন। যাই হোক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে যে উত্তরণ ঘটেছে— সেই বিশ্বাসবোধ, মমত্ববোধ নিয়ে লেখা 'কুশী-প্রাঙ্গনের চিঠি'।

কুশী বন্দনার সঙ্গে তিনি এর দুই তীরবর্তী যেসব মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন তারই মনোরম চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাদলাঘাট থেকে কুশীর এলাকা আরম্ভ।একে একে বাদলাঘাট, ধামারঘাট, কোপারিয়া প্রভৃতি তিনি অতিক্রম করেছেন। পথের চারপাশে কুশীর বিস্তীর্ণ এলাকা। তাঁর কুশী যাত্রা নিঃসঙ্গ। কিন্তু নিঃসঙ্গ হলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মৈথিল পণ্ডিতজীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি লেখককে কৌশিকী ও কমলার পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়েছেন। বাঙালি নারী সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটি প্রানিধানযোগ্য— "যতই বলুন, ছেচ্ছভাবাপন্ন আপনারা একটু বেশি রকমই বাঙালিবাবু, একথা আমি বলবই।

ক্রমশ

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঃ আধুনিক বাংলার রূপকার

শিবপ্রসাদ চৌধুরী

সমস্যা সংকুল এই বিশাল উপ মহাদেশকে বিভিন্নভাবে মুক্তির পথ দেখাতে ঝাঁকে ঝাঁকে অনেক মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁদের মধ্যে একজন। মূলত আমরা তাঁকে এক খ্যাতিমান চিকিৎসক হিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে থাকি। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, সততা, ত্যাগ, দেশবাসীকে অন্তহীন ভালোবাসা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা লক্ষ্য করলে নিশ্চয়ই একজন বাঙালী হিসাবে গর্বিত হতে হয়।

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য ছিলেন বারো ভূঁইএার একজন। বিধানচন্দ্র সেই পরিবারের সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ সালের ১ জুলাই বর্তমান বিহার রাজ্যের অন্তর্গত পাটনার বাঁকিপুরে বিধানচন্দ্র রায় জন্ম গ্রহণ করেন। প্রকাশচন্দ্র রায় ও অঘোর কামিনীদেবীর ছয় সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন বিধানচন্দ্র। একান্নবর্তী পরিবারের পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন। তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়েছিল এক গ্রাম্য পাঠশালায়, পরে পাটনার টিকে ঘোষ ইনস্টিটিউশন এবং পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে পাটনা কলেজ থেকে গণিতে অনার্সসহ বি এ পাশ করে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। ইতিমধ্যেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটেছে। পিতা ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাই আর্থিক স্বচ্ছলতা বিশেষ ছিলনা। চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করার জন্য তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি এলএমএস ও এমডি উপাধি লাভ করেন। যে কথা আবার আগেই হতে হয় যে, তিনি পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য কখনও মেন নার্সের কাজ করেও অর্থ জোগাড় করেছেন।

সেই সময় দেশে সুচিকিৎসার অভাবে বহু মানুষ নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে ভুগে প্রাণ হারাত। দেশে শোভাঙ্গ চিকিৎসকদেরই দাপট ছিল বেশি। তাদের কাছে কজনই বা আর পৌঁছতে পারতো? চিকিৎসা ক্ষেত্রের এই দুরাবস্থা বিধানচন্দ্রকে পীড়িত করত। তাই চিকিৎসাশাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। সেখানেও তিনি তীব্র লড়াই করে আর মনের জোড়েই টিকে থাকেন এবং মাত্র দুই বছরের মধ্যে একই সাথে এমআরসিপি, এমআরসিএস ও পরে এফআরসিএস উপাধি অর্জন করেন।

বিদেশ থেকে ফিরে এসে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ) সরকারী চাকুরী নেন। দুই বছর পর সেই চাকরী ছেড়ে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের (বর্তমানে আরজিকর মেডিকেল কলেজ) অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এখানে কর্মরত অবস্থাতেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। এদিকে সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পেশায় বিপুল সাফল্য বিধানচন্দ্রকে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মাত্র সাড়ে আট বছরের প্র্যাকটিসে কলকাতায় প্রাসাদোপম বাড়ি এবং গাড়ির মালিক হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তাঁর রোগীর তালিকায় তখন কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেনা? এর মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আছেন। ছিলেন মতিলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী, জহওরলাল নেহেরু, কমলা নেহেরু বল্লভভাই প্যাটেল, ইন্দিরা গান্ধীসহ সকলেই। চিকিৎসক হিসাবে তিনি যে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ছিলেন তা দু-একটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়। তিনি যেখানে চেম্বারে বসতেন সেখানে আসতে রোগীকে একটু হেঁটে আসতে হত। ওই কয়েক ফুট হেঁটে আসার মধ্যেই তিনি রোগীকে এতই নিরীক্ষণ করে দেখতেন যে তার রোগের কারণ বুঝতে পারতেন এবং অতি সহজ সরল চিকিৎসার সাহায্যে তা নির্মূল হত। মফস্বলের এক ভদ্রমহিলা অসহ্য মাথার যন্ত্রণা নিয়ে বহু ডাক্তার দেখিয়ে অবশেষে বিধানচন্দ্রের কাছে পৌঁছান। ধন্বন্তরি ডাঃ বিধানচন্দ্র তাকে দেখেই বলেন, 'খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে না? আপনি যে সিঁদুরটা ব্যবহার করেন সেটা পাল্টে অন্য সিঁদুর ব্যবহার করবেন।' রোগী তার রোগ বলার আগেই ডাক্তারবাবু রোগীর রোগ নিরাময় করে দিলেন। এরকার তাঁর চেম্বারে অপেক্ষমান এক রোগীর কাশির শব্দ শুনে তা যক্ষা কাশি বলে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর এই দেশজোড়া খ্যাতি ও প্রসারে তখন তার মাসিক আয় লক্ষাধিক টাকা পেরিয়ে গেছে।

১৯১৬ সালে বিধানচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতবর্ষে তখন স্বাধীনতার আন্দোলন উত্তাল অবস্থায়। মতবিরোধের জেরে দেশবন্ধু তখন কংগ্রেসের বাইরে স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতারা। তখন বাংলা তথা ভারতের অবিসংবাদিত জননেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবে বিধানচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ দেন ১৯২৩ খ্রিঃ। স্বরাজ্য দলের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধানচন্দ্র বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯২৮ খ্রিঃ কলকাতা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৩১-৩২ খ্রিঃ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন। বিধানচন্দ্র ছিলেন দেশপ্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভিক। ১৯৩১ সালে মহাত্মাগান্ধীর ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি অকুতোভয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই সময় কোম্পানি থেকে ফেরার পথে ওয়ার্ধা স্টেশনে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। একদিকে তাঁর ব্যক্তিত্ব অন্যদিকে তাঁর পাণ্ডিত্য ক্রমেই তাঁকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ জায়গা করে দেয়। ১৯৩৫ সালে রয়্যাল সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন, ১৯৪০ সালে আমেরিকান সোসাইটি চেষ্ট ফিজিসিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ খ্রিঃ বাংলার পার্লামেন্টারি কমিটির সভাপতি হন এবং কংগ্রেসের নির্বাচন পরিচালনা করেন। ১৯৪২ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁরই ঐকান্তিক ইচ্ছায় গড়ে ওঠে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ। এছাড়াও পুরুলিয়া, রহড়া ও নরেন্দ্রপুরে আশ্রমিক পরিবেশে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়।

সেই সময় ঘটল আর এক ঘটনা। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এক অত্যন্ত সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাজনীতিক। কিন্তু কোনো কারণে তাঁকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরতে হয়। শুরু হল নতুন যুগের। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আকস্মিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে হল এবং আমৃত্যুকাল এই পদের দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন।

দেশভাগের ফলে রাজ্যের চটকলগুলিতে পাটের যোগান বন্ধ হতে চলেছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরি করলেন কল্যাণী উপনগরী, লেকটাউন, লবণহ্রদ নগর যা তাঁর মৃত্যুর পর নামকরণ হয় 'বিধাননগর'। দুঃস্থ সরবরাহের জন্য গড়ে তুললেন হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প। শিক্ষিত বেকারদের বিপুল পরিমাণে কর্ম বিনিয়োগের জন্য সৃষ্টি করলেন কলকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্থা। শিল্প সমৃদ্ধ বাংলা গড়তে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় স্থাপিত হল দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা, হলদিয়া নদীবন্দর, ফারাক্কা ব্যারেজ তাঁরই অবদান। তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে নবগঠিত পশ্চিমবাংলার প্রভূত উন্নতি সাধন হয়। তাই তাঁকে পশ্চিমবাংলার নবরূপকার বলা হয়।

এই সত্যনিষ্ঠ দিকদর্শী দেশপ্রেমিক মহান মানুষটি ১৯৬১ সালে ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন। ডাক্তারি পেশা এক মহান পেশা। ডাক্তারদের মহান অবদানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পৃথিবীর বহু দেশ চিকিৎসক দিবস পালন করে। আমাদের দেশ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, পৃথিবীর জোড়া খ্যাতির অধিকারী আধুনিক কালের ধন্বন্তরি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন (একই সাথে ঐ দিনই মৃত্যু দিবস) টিকে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। পরিশেষে একথা বলা যায়, আজকে বাঙালী হিসাবে যখন আমরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে আমাদের দেশের নিরিখে হতাশায় ভুগি তখন এই সব প্রাতঃস্মরণীয় কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করলে নিশ্চয়ই বেঁচে থাকার প্রেরণা পাওয়া যায়। সারা দেশই শুধু নয়-সারা বিশ্বের যে সমস্ত মহান রাষ্ট্রনায়করা এই পৃথিবীতে জন্মেছেন এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিয়েছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কর্মকাণ্ড তার থেকে কোনো অংশে কম বলা যায় না। তাঁর জীবনী, তাঁর কর্মকাণ্ড, তাঁর নৈতিকতা, তাঁর নিষ্ঠাকে অনুসরণ করলে আজকের প্রজন্মের অনেকেই সমাজের আদর্শ একজন হয়ে উঠতে পারবে। আর তখনই হবে আমাদের চিকিৎসক দিবস পালন সার্থক।

সম্পাদক সমীপেষু

এই জ্যোৎস্না রাতে জাগে আমার প্রাণ

একটা রাত যা জ্যোৎস্নায় ভরে উঠেছিল সেদিন। সেই জ্যোৎস্না রাতেই আলোকিত হয়ে উঠেছিল তিলোত্তমা নগরী কলকাতা। সেদিন এই ধরণীর বুকে একটা শিশুর জন্ম হয়েছিল, সেই শিশুই যে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আলোকিত করে তুলবেন তা সেদিনই বোঝা গিয়েছিল। সেদিনটা ছিল ৭ মে, সালটা ছিল ১৮৬১, সময় রাত ২টো বেজে ৩৮ মিনিট ৩৭ সেকেণ্ড। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তখন একটা আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে। মা সারদার কোল আলো করে যে শিশুটা এসেছে, যার কিরণের ছটায় সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গিয়ে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেই শিশুটিই রবি হয়ে আলোয় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। সোমবারের সেই রাতটায় যেন ঠাকুরবাড়িতে আনন্দের লহড়া চলছে। পুত্র সন্তান হবার জন্য গর্বিত হয়ে উঠেছে ঠাকুরবাড়ি। অষ্টম পুত্র হিসাবে যে শিশুটা সেদিন জন্মেছিলেন, সেই শিশুর নাম রাখা হলো রবি। আমাদের কবি হয়ে যিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর নিজের পরিচয়টা তুলে ধরলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে। একটা শিশু তার মধ্যে থাকা প্রতিভাটাকে কলমের স্পর্শে বুঝিয়ে দিলেন। এই জগৎ সংসারে থেকে সবকিছু দেওয়া যায়, যদি ভাবনাটাকে ভালো করে ভাবা যায়। একদিকে ভারতের জাতীয় সংগীতের জনক করে গেলেন, অপরদিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রচনা করে দিলেন বিশ্বের কবি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রতিবাদের ভাষায় নিন্দা করলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের। নিজের প্রাপ্তিকুল সম্মানটাও ছেড়ে দিলেন নাইট উপাধি ত্যাগ করে। বাংলার মাটি, বাংলার জল গান রচনা করে পথে নেমে পড়লেন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে। সম্পর্কটুকু যেন অটুট থাকে, তারই জন্য রাখীবন্ধনের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে একত্রিত করে একই মঞ্চে এনেদিলেন ও বাংলার প্রতিটি মানুষকে বোঝাতে চাইলেন এর সারমর্ম। যাদের ভয়ে তোমরা পিছিয়ে যাচ্ছো, তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। ভয়কে জয় করো নাও/ পরাধীনতার অন্ধকার মোচন করো/ এই দেশটা মুক্ত হতে দাও। কবিগুরুর সেই বাণী প্রতিটি বীর সৈনিকের মধ্যে একটা জাগরণ এনে দিয়েছিল। জাগ্রত ভারতবর্ষের মানুষ সেদিন একটা অগ্নিমন্ত্র পেয়ে গিয়েছিল। পরাধীনতার অন্ধকার মোচনে নিজেদের তুলে ধরতে পেরেছিলেন। রাখীবন্ধনের মাধ্যমে কবিগুরু যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তেমনই এক রাখীবন্ধনের দিন ছিল ৭ আগস্ট, ১৯৪১ সাল। বাংলার ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ সন। সেদিনই আমাদের রবি বিশ্বের কবি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে অমৃতলোকে পাড়ি দিলেন। স্বয়ং কবি লিখে গেছেন— সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ পাতে/ অরুণ-বরুণ-পারিজাত লয়ে হাতে/নিদ্রিত পুরী পথিক ছিল না পথে/একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে/বারেক থামিয়া মোর বাতায়ন পানে/চেয়েছিলে তব করুণ নয়ন পাতে/সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিককেরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়